১। সংস্কৃত সাহিত্যে জয়দেবের প্রতিভা আলোচনা কর। তার গীতগোবিন্দ কোন জাতীয় কাব্য তা বিচার কর।

জয়দেব সংস্কৃত সাহিত্যের শেষ বাঙালি কবি যার রচনার দ্বারা বাংলা সাহিত্য বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছে। তিনি সংস্কৃত সাহিত্যের কবি হয়েও বাঙালি হৃদয়ে তার আসন তৈরী করে নিতে পেরেছেন কারন তার কাব্যের ভাব ও ভাষা একান্তভাবে বাংলা ও বাঙালির। তাই বাঙালি ও বাংলা সাহিত্য তাঁকে বিস্মৃত হয়নি। বাংলা ভাষা সৃষ্টির ঠিক পূর্ব মুহূর্তে জয়দেবের মধুর কোমলকান্ত পদাবলীর ভাষা বাংলা ভাষা উদ্ভবের সূচনা প্রস্তুত করে গিয়েছে।

জয়দেবের জীবনবৃত্তান্ত সম্বন্ধে বহু লোক-শ্রুতি প্রচলিত থাকলেও সুদৃঢ় প্রমানের উপর ভিত্তি করে কোনোও বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যায়নি। চন্দ্রদত্ত প্রণীত সংস্কৃত 'ভক্তমাল' ও নাভাজিদাসের হিন্দি 'ভক্তমাল' এবং বীরভূমের 'জয়দেব চরিত' গ্রন্থে এই জাতীয় বহু উপকথা সংগৃহীত হয়েছে, তা থেকে মোটামুটি জানা যায় অজয় নদের তীরে বীরভূম জেলার কেন্দুবিল্ব গ্রামে তার জন্ম। জয়দেবের পিতা ভোজদেব, মাতা বামাদেবী (মতান্তরে রাধাদেবী), পত্নী পদ্মাবতী। ভক্তমাল এবং বাংলায় প্রচলিত অন্যান্য তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায় — পদ্মাবতী পুরী ধামে জগন্নাথ মন্দিরে নৃত্য করতেন। সম্ভবত পদ্মাবতী জগন্নাথ মন্দিরে দেবদাসী ছিলেন। পুরীর মন্দিরেই জয়দেবের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে কবি তার পাণি গ্রহন করেন। কবি নিজেকে 'পদ্মাবতী চরণ চারণ চক্রবর্তী' বলেছেন। নাভাজিদাসও জয়দেব স্তুতি প্রসঙ্গে বলেছেন "জয়দেব কবি হলেন রাজ চক্রবর্তী, অন্য সব কবিরা খন্ড মন্ডলেশ্বর, ত্রিলোকের এই গীতগোবিন্দ সংস্কৃত সাহিত্যে উজ্জ্বল হয়ে আছে।"

জয়দেবের গীতগোবিন্দের বিষয় রাধাকৃষ্ণের বসন্তরাস। গীতগোবিন্দ কাব্যখানি দ্বাদশ সর্গে রচিত, কবি প্রত্যেক সর্গের স্বতন্ত্র নামকরন করেছেন। সেগুলি হল সামোদ দামোদর, অক্লেশ কেশব, মুগ্ধমধুসূদন, স্নিগ্ধ মধুসূদন, সাকাঙ্ক্ষ পুন্ডরীকাক্ষ, ধৃষ্ট বৈকুণ্ঠ, নাগরনারায়ন, বিলক্ষ লক্ষ্মীপতি, মুগ্ধ মুকুন্দ, মুগ্ধ-মাধব, সানন্দ-গোবিন্দ ও সুপ্রীত পীতাম্বর। এই বারোটি সর্গে কবি মূল কাহিনী বিন্যস্ত করেছেন। প্রথমে আছে মঙ্গলাচরণের শ্লোক, দশাবতার স্তোত্র ইত্যাদি। মূল কাব্যের আরম্ভ অপূর্ব বসন্ত দিয়ে, দেখা যায় বৃন্দাবনের বনে কৃষ্ণের অন্বেষনে ঘুরে বেড়িয়ে রাধা ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। এমতাবস্থায় তিনি সখির মুখে শুনতে পান অন্য নায়িকাদের নিয়ে আনন্দে মেতে উঠেছেন। সখিমুখে একথা শুনে নিতান্ত ম্রিয়মান হয়ে পড়েন রাধা। তিনি তখন অপর একটি কুঞ্জে গিয়ে তার পূর্ব মিলনের কথা স্মরণ করতে থাকেন। অন্যদিকে কৃষ্ণের সম্বিৎ ফিরে এলে তিনি রাধার সন্ধানে তৎপর হয়ে ওঠেন এবং সখীর মারফৎ জানতে পারেন কৃষ্ণবিরহে রাধা

নিতান্ত মনোকষ্টে কালাতিপাত করছেন। এই সংবাদ শুনে অপরাধী কৃষ্ণ এক সখিকে পাঠান রাধাকে তার কাছে নিয়ে আসার জন্য। সখি ফিরে এসে জানান রাধা কৃষ্ণ-চিন্তায় এমনই তন্ময় যে কৃষ্ণেরই স্বয়ং রাধার কুঞ্জে যাওয়া উচিত। অদিকে কৃষ্ণের প্রতিক্ষায় কাল কাটাতে কাটাতে রাধা নিতান্ত ব্যাকুল হয়ে চোখের সামনে বহুবল্লভ কৃষ্ণের ছবি দেখতে থাকেন, ক্রমশ রাত্রি প্রভাত হয়ে আসে এবং রাধারকুঞ্জদ্বারে এসে দাঁড়ান ভোগলাঞ্ছিত কৃষ্ণ। নিতান্ত অভিমান ভরে প্রথমে তিনি তাকে প্রত্যাখ্যান করেন কিন্তু রাধার মনের এই ক্ষোভ দীর্ঘস্থায়ী হয়না তিনি মানসিক ভাবে ভেঙে পড়ে কাঁদতে থাকেন। এক সখি কৃষ্ণকে শ্রীমতির এই অবস্থার কথা জানালে সন্ধ্যার অন্ধকারে কৃষ্ণ উপস্থিত হন রাধার কুঞ্জদ্বারে। কৃষ্ণ রাধার মানভঞ্জনে প্রয়াসী হয়ে বললেন —

"স্মরগরলখণ্ডনম্ মমশিরসি মণ্ডনম্
দেহি পদপল্লব মুদারম্"।

কৃষ্ণের এই আচরনে পূর্বের সকল বেদনা ভুলে গিয়ে রাধা প্রসন্ন হয়ে ওঠেন। তিনি কৃষ্ণকে গ্রহন করে প্রবেশ করেন বাসরগৃহে। দীর্ঘ প্রতিক্ষার অবসানে উভয়ের মিলন সম্পন্ন হয়।

গীতগোবিন্দ নাট-গীতের আকারে লেখা উক্তি প্রত্যুক্তিমূলক কাব্য, যুগ যুগ ধরে এই কাব্য সাহিত্য রসপিপাসুদের তৃষ্ণা নিবারন করে আসছে। অনেকেই এই কাব্যকে লৌকিক প্রেমের আখ্যান বলে অভিহিত করেছেন। আবার ভারতীয় সাহিত্যে গীতগোবিন্দ ভক্তিকাব্য হিসাবেও শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত। তাদের কাছে এই কাব্য দেহাতীত দিব্য প্রেমের বার্তা বহন করে চলেছে। যাইহোক এইকাব্যে দিব্য প্রেমের সূক্ষ্ম আস্তরন থাকলেও সঠিক বিচারে এটি মর্ত্যপ্রেমেরই কাব্য। কৃষ্ণরাধার মধ্য দিয়ে কবি ইন্দ্রিয়চারী প্রেমকেই প্রতিষ্ঠাদিতে চেয়েছেন। ~~সে যাইহোক~~ জয়দেবের এই কাব্য অতি মধুর, ভাষা, সুললিত পরিমার্জিত ও প্রতিশ্রুতির। তার রস শৃঙ্গাররস। এই কাব্যে মানবপ্রেমের দেবায়ন প্রতিফলিত। কবি নিজে বলেছেন —

"যদি হরি স্মরনে সরসং মনোঃ
যদি বিলাস কলাসু কুতুহলম্
মধুর কোমলকান্ত পাদাবলীং
শৃণু তথা জয়দেব সরস্বতীম্"

যদি হরি স্মরনে মনকে সরস করতে ও যদি বিলাসকলা সমূহে কৌতুহল থাকে তবে জয়দেবভারতীর মধুর কোমলকান্ত পাদাবলী শ্রবণ করো।

অর্থাৎ এই কাব্য হরির বিলাসবর্ননা এবং এই কাব্য হৃদয়কে সরস করে। জয়দেব পরিপূর্ন প্রেম ও সৌন্দর্যের কবি। তিনি অপার্থিবকে পার্থিব রূপ ও রসের সীমানায় লাভ করতে প্রয়াসী হয়েছেন। এই কাব্যের ভাষা ও ছন্দ প্রসংশার দাবি করতে পারে। গীত-গোবিন্দের ভাষা বিচার করে প্রথমে লাসেন ও পরে পিশেল সাহেব মন্তব্য করেছেন যে গীতগোবিন্দের পদগুলির ভাষা-ছন্দ ও অন্ত্যানুপ্রাসের মধ্যে অপভ্রংশের স্পষ্ট প্রভাব উপলব্ধি করা যায়। গীতগোবিন্দের ছন্দের মধ্যে যে অপভ্রংশের প্রভাব রয়েছে তা অবশ্য-স্বীকার্য। ঘটনা বর্ননায় এবং কৃষ্ণ, রাধার ও সখির উক্তি প্রত্যুক্তিগুলি সংস্কৃত জাতি ছন্দে রচিত —

"পততি পতত্রে বিচলিত পত্রে শঙ্কিতভবদুপযানম্
রচয়তি শয়নম্, সচকিত নয়নম্
পশ্যতি তব পন্থানম্,"

এই ছন্দের মধ্যে প্রাচীন বাংলার সুর অনুরনিত হয়। কোনো কোনো সমালোচকের মতে গীতগোবিন্দের গানগুলি প্রথমে অপভ্রংশে অথবা প্রাচীন বাংলায় রচিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে এইগানগুলি সংস্কৃতে অনুবাদ করা হয়।

গীতগোবিন্দ কোন জাতীয় রচনা তা নিয়ে পন্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। এই রচনাটিতে কবি এমন এক আঙ্গিকে সৃজন করেছেন যা সংস্কৃত সাহিত্যে সত্যই অভিনব। কবি নিজে গীতগোবিন্দকে 'প্রবন্ধ' বলেছেন আবার প্রতিটি সর্গের পুষ্পিকায় 'মহাকাব্য' অভিধাটি ব্যবহার করেছেন। প্রবন্ধ শব্দটির দ্বারা ভাষা ছন্দরচনা ইত্যাদির প্রকৃষ্ট বন্ধনকেই বুঝিয়েছেন, আবার কাব্য হিসাবে তিনি একে মহাকাব্য বলতে চেয়েছেন। অষ্টাধিক সর্গে রচিত ধীরোদাত্ত বহু গুনান্বিত নায়কযুক্ত এই কাব্যের অঙ্গীরস ও একটি — শৃঙ্গাররস। তবু মহাকাব্যোচিত বিশালতা ও বৈচিত্রের অভাবে গীতগোবিন্দ মহাকাব্য হয়ে উঠতে পারেনি, এই কাব্যের শ্রেনীবিচার সম্বন্ধে বিভিন্ন মতগুলি হল

লাসেন এই কাব্যকে 'গীতিনাট্য' আখ্যা দিয়েছেন,
উইলিয়াম জোনস্ একে 'রাখালিয়া নাট্যগীতি' বলেছেন।
পিশেল ও লেভির মতে এটি 'অপেরা' জাতীয় রচনা,
ভন শ্রোয়েডার একে উন্নত ধরনের 'যাত্রা' আখ্যা দিয়েছেন,

ভারতীয় সমালোচকদের মধ্যে অধ্যাপক সুকুমার সেন এটিকে 'নাট্য প্রবন্ধ' বলেছেন। ড: নীহাররঞ্জন রায় এগুটিকে 'গীতিকাব্য' বলেছেন।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সমালোচকদের এই নানাবিধ মত প্রমান করে গীত-গোবিন্দে কোনো অবিমিশ্র রচনারীতি অনুসরন করা হয়নি। এখানে নাট্য-ধর্মীতা, গীতি প্রবনতা, বর্ননা ধর্মীতা সবকিছু বৈশিষ্ট্য মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

২। বাংলা সাহিত্যে গীতগোবিন্দের প্রভাব :

গীতগোবিন্দের প্রভাব ভারত ব্যাপি হলেও ~~বাঙালি~~ জয়দেবের এই কাব্যের প্রভাব বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেই সর্বাধিক ও সুদূর প্রসারী, বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে গীতগোবিন্দের অবিচ্ছেদ্য যোগ বর্তমান, আর এই যোগ বহিরঙ্গ রূপগত, অন্তরঙ্গ ভাবগত এবং সর্বোপরি কবিদের উপর প্রভাব গত।

৩। কালিদাসের নাট্যপ্রতিভা

সংস্কৃত সাহিত্যের মহাকবি ও নাট্যকার রূপে কালিদাসের সমতুল্য প্রতিভা বিরল, রবীন্দ্রনাথ কালিদাসকে সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবির মর্যাদা দিয়েছেন, কালিদাসের কাব্য ও নাটক দেশে বিদেশে সমাদৃত হয়েছে, আমরা এখানে তার রচিত তিনখানি নাটক বিষয়ে আলোচনা করব।

কালিদাসের প্রথম নাটক মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকটি পঞ্চাঙ্কে লিখিত; এবং বসন্ত উৎসব উপলক্ষ্যে উজ্জয়িনিতে প্রথম অভিনীত হয়েছিল। নাটকের কাহিনীতে নামমাত্র ঐতিহাসিক সূত্র রয়েছে, তাছাড়া বাকি অংশ সম্পূর্ন কাল্পনিক। এর নায়ক শুঙ্গ বংশজাত মগধরাজ পুষ্যমিত্রের পুত্র অগ্নিমিত্র এবং নায়িকা বিদর্ভরাজ কন্যা মালবিকা। মালবিকা অদৃষ্টক্রমে শবর সৈন্যদের দ্বারা অপহৃতা হয়ে মগধের পাটরানী ধারিনীর কাছে আশ্রয়লাভ করেন। পরিচারিকা মালবিকার শিল্পনৈপুন্য দেখে মহাদেবী ধারিনী নাট্যাচার্য গনদাসের কাছে তার অভিনয় নৃত্যাদি শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। এই অপূর্ব সুন্দরী পরিচারিকাকে ধারিনী সযত্নে রাজার দৃষ্টির আড়ালে রাখার চেষ্টা করেন। কিন্তু রাজবাড়ির চিত্রশিল্পি অঙ্কিত মহারানী ও তার পার্শ্বচারিনীর এক ছবিতে অগ্নিমিত্র মালবিকার চিত্র দেখে মুগ্ধ হন এবং তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। অতঃপর বাল্যসখা বিদূষক গৌতমের কৌশলে উভয়ের সাক্ষাৎ সম্ভব হয়। কিন্তু মিলনের পথে নানা বাধা উপস্থিত হয়, একে একে বিদূষকের বুদ্ধি ও কৌশলে সকল বাধা অপসারিত হয়। পঞ্চম অঙ্কে কাহিনীর জটিলতা কেটে যায় শেষ পর্যন্ত মালবিকা ও কৌশিকির প্রকৃত পরিচয় উদ্ঘাটিত হয়। কৌশিকি জানায় যে এক সন্ন্যাসির পরামর্শেই মালবিকার সত্য পরিচয় এতদিন গোপন রাখা হয়েছিল। এইসময় কঞ্চুকি এসে জানায় যে মহারাজ অগ্নিমিত্রের পুত্র বসুমিত্র সিন্ধুতীরে যবনদের পরাজিত করে পিতামহ পুষ্যমিত্রের অশ্বমেধের ঘোড়া উদ্ধার করেছেন, অতএব এখন যজ্ঞ সমাপ্ত করা হবে, এই দুই শুভ বার্তায় বিশেষ করে পুত্রের বিজয়গর্বে গর্বিতা ধারিনী ইরাবতীর সম্মতি নিয়ে মালবিকাকে স্বামীর হাতে সমর্পন করেন। এইভাবে মিলনের মধ্য দিয়ে নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। এই নাটকের কয়েকটি চরিত্র – পুষ্যমিত্র, অগ্নিমিত্র, ও বসুমিত্র ঐতিহাসিক সূত্র থেকেই গৃহীত। কাহিনী বয়নে নাট্যকারের দক্ষতা লক্ষনীয়। এছাড়া চরিত্রচিত্রন ও রাজঅন্তঃপুরের বিলাসবৈভব ও ভোগাসক্তির চিত্র রচনাতেও কালিদাসের নৈপুন্যের পরিচয় পাওয়া যায়, রাজা অগ্নিমিত্র, রানী ধারিনী ও ইরাবতী এবং মালবিকার চরিত্র জীবন্ত ও যথার্থ হয়েছে এই নাটকে। অগ্নিমিত্র ধীর ললিত নায়ক। কোমলে কঠোরে তার চরিত্র গড়া। মালবিকার জন্য তিনি আবেগ উচ্ছল আবার দুই রমনীর-

ভয়ে তিনি দ্বিধাগ্রস্ত, ধারিণী ও ইরাবতী দুটি বিপরীতধর্মী চরিত্র। ধারিণী ধীর ও গম্ভীর, ইরাবতী ক্রোধি এবং দর্পকটুভাষী। এই নাটকে কালিদাস বিদূষকের চরিত্রকে গুরুত্বদান করেছেন। কৌশলী কৌতুকে বিদূষক এখানে রাজার প্রেমের প্রধান সহায়ক। মালবিকার ধৈর্যশীল হৃদয়ের পরিচয় নাট্যকার যেটুকু দিয়েছেন, তার চেয়ে বেশি তার বান্ধবী কৌশিকির পরিচয় উদ্ঘাটিত করেছেন। সেই-ই ধারিণীকে তুষ্ট করেছে এবং মালবিকার প্রতি সহানুভূতিশীল করে তুলেছে। নাটকের সংলাপ নাট্যগুণান্বিত ও স্বচ্ছন্দ। এই নাটকটিকে কেবলমাত্র একটা প্রেমকাহিনী বলে মনে করলে ভুল হবে। এখানে রয়েছে মানব চরিত্রের সংকীর্ণতা ও মহত্বের পরিচয়, তৎকালীন রাজ অন্তঃপুরের বিলাসময় জীবনের প্রতি কটাক্ষ। সবদিক থেকে বিচার করলে এই নাটকটিকে কালিদাসের একটি সার্থক নাট্যরচনা হিসাবে মর্যাদা দেওয়া যায়।

কালিদাসের দ্বিতীয় নাটক বিক্রমোর্বশী প্রতিও পঞ্চাঙ্কে বিভক্ত। এবং বৈদিক সাহিত্য ব্রাহ্মণ ও পুরাণের পুরুর্বা পুরূরবা ও উর্বশীর প্রেমকাহিনী অবলম্বনে রচিত, অবশ্য কাহিনী গ্রন্থনে ও চরিত্র চিত্রনে কালিদাসের স্বকীয় কবিকল্পনায় নাটকটি অসামান্য হয়ে উঠেছে। নাট্যকাহিনীটি নিম্নরূপ।

শিব অর্চনার জন্য উর্বশী কৈলাসে গিয়েছিলেন, ফেরার সময় কেশিদানব তাকে অপহরণ করে। সেই সময় পুরূরবা সূর্য-পূজা করে ফিরছিলেন, অকস্মাৎ নারীকণ্ঠের আর্তনাদ শুনে তিনি অসুর নাশ করে উর্বশীকে উদ্ধার করে তার সখীদের কাছে পৌঁছে দিলেন। এই ঘটনাসূত্রেই উর্বশী ও পুরূরবা পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েন। তাদের অনুরাগ দিনদিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। উর্বশী স্বর্গে ফিরে গেলেও তার মন পড়ে থাকে রাজার কাছে। এদিকে পুরূরবা নিজরাজ্যে ফিরে গিয়েও উর্বশীর চিন্তায় বিভোর থাকেন। রাজার উন্মনাভাব রানী মহাদেবীর দৃষ্টি আকর্ষন করে এবং তিনি অনুসন্ধান করে রাজার প্রেমবিষয়ে অবগত হন, রানীর কাছে, হাতেনাতে ধরা পড়ে রাজার অবস্থা হয়ে ওঠে আরও শোচনীয়। ওদিকে স্বর্গের দেবসভায় 'লক্ষ্মীস্বয়ম্বর' নাটকে লক্ষ্মীর ভূমিকায় অভিনয় করতে গিয়ে পুরূরবার প্রেমে গভীরভাবে মগ্ন উর্বশী 'পুরুষোত্তম' নাম উচ্চারণ করতে গিয়ে 'পুরূরবা' নাম উচ্চারন করায় আচার্য ভরত ক্রুদ্ধ হয়ে উর্বশীকে স্বর্গভ্রষ্ট হবার অভিশাপ দেন। দেবরাজ ইন্দ্র তখন উর্বশীর প্রতি অনুকম্পাবশত বলেন — "যার প্রতি তুমি অনুরাগিনী সেই পুরূরবা আমার যুদ্ধের সহায় : তার উপকার করা আমার কর্তব্য। অতএব যতদিন না তার সন্তান জন্মগ্রহন করে ততদিন তুমি যথেচ্ছ তার সঙ্গে বাস কর।"

এইভাবে উর্বশীর জীবনে অভিশাপ আশীর্বাদ হয়ে দেখা দেয়, তবে কথা রইল—সন্তানের জন্মের পর পুনরায় উর্বশী স্বর্গে ফিরে যাবে। তৃতীয় ও চতুর্থ অঙ্কে নানা ঘাত প্রতিঘাতময় ঘটনা রয়েছে। উর্বশীর দুই সখীর মুখথেকে পরবর্তী ঘটনা জানা গেছে। অমাত্যদের উপর রাজ্য পরিচালনার ভার ন্যস্ত করে রাজা পুরূরবা উর্বশীর প্রেমে বিরা দিয়ে কৈলাসশিখরে গন্ধমাদন বনে যান, সেখানে মন্দাকিনী-তীরে এক বিদ্যাধর কন্যার প্রতি রাজার দৃষ্টি আকৃষ্ট হলে উর্বশী অভিমান ভরে রাজাকে পরিত্যাগ করে কুমারবনে প্রবেশ করেন। কিন্তু চিরকুমার কার্তিকেয়র সংরক্ষিত এই বনে স্ত্রীলোকের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। ফলে উর্বশী বনে প্রবেশ করামাত্র একটি লতায় পরিনত হলেন, এদিকে তাকে দেখতে না পেয়ে রাজা পুরূরবা শোকে পাগলের মত হয়ে গেলেন, সমগ্র চতুর্থ অঙ্ক বিরহে উন্মত্ত রাজার প্রেমপ্রলাপোক্তিতে পরিপূর্ন। এমনিভাবে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ তার নজরে পড়ল এক রক্তবর্ন মনি, যাকে তিনি 'রক্তাশোক' ভেবে প্রিয়ার জন্য চয়ন করে আবার ফেলে দিতে উদ্যত হয়েছিলেন, সহসা দৈববানী হল— "এই দুর্লভ মনির দ্বারা তুমি তোমার হারানো প্রিয়াকে ফিরে পাবে," রাজা কুমার বনে প্রবেশ করে ঐ মনি হাতে একটি পুষ্পবিহীন লতাকে স্পর্শ করামাত্র জীবন্ত উর্বশীকে নিজের আলিঙ্গনে ফিরে পেলেন, পঞ্চম অঙ্কে ঘটনার উপসংহার। এই অঙ্কে উর্বশীর গর্ভজাত সন্তানের সঙ্গে রাজার পরিচয় ঘটে, কিন্তু দুজনের মন বিচ্ছেদ-ভাবনায় বিষাদকাতর হয়ে পড়ে, হঠাৎ রাজসভায় নারদের আবির্ভাব ঘটে, তিনি জানান—দেবরাজ ইন্দ্র পুরূরবাকে অস্ত্রত্যাগ করতে নিষেধ করেছেন এবং পুরূরবার পাশে উর্বশী পত্নীরূপে সারাজীবন থাকতে পারবেন বলে জানিয়েছেন।

এই নাটকে কালিদাস বেদ, পুরান ও প্রচলিত লোককথা থেকে উপাদান সংগ্রহ করলেও মৌলিক কল্পনায় তাকে অভিনব করে তুলেছেন। নাটকের চতুর্থ অঙ্ক কালিদাসের অপূর্ব সৃষ্টি। উর্বশীর আবেগদীপ্ত ভালোবাসা, পুরূরবার বিরহের উন্মত্ততা আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে। বিশ্বসাহিত্যে এই গীতি-উচ্ছ্বাস দুর্লভ, নাটকের সঙ্গীতগুলি অত্যন্ত মধুর ও সময়-উপযোগী। উর্বশীর চরিত্রে না আছে স্বভাবের সংযম, না আছে মাতৃত্বের গৌরব, নন্দনবাসিনী উর্বশী অপ্সরা রূপেই চিত্রিত। সেই তুলনায় ঔশীনরীর চরিত্রটি অনেক মানবিক হয়ে উঠেছে। প্রকৃতি বর্ননাতেও কালিদাস তাঁর চমৎকার কবিপ্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন।

"অভিজ্ঞান শকুন্তলম" কালিদাসের সর্বশেষ এবং সবদিক থেকে পরিণত নাট্যরচনা। এই নাটকটির দ্বারাই কালিদাস বিশ্বসাহিত্যে অমর স্থানলাভ করেছেন, এই নাটকে কালিদাসের চমৎকারিনী কল্পনাশক্তি ও চিত্তহারিনী রচনাশক্তির পরিচয় দিয়েছেন,

অভিজ্ঞান শকুন্তলম সাত অঙ্কে বিভক্ত একটি পূর্ণাঙ্গ নাটক। কালিদাস ছয়টি অঙ্কেরই নামকরন করেছেন, বিষয় অনুযায়ী। প্রথম অঙ্ক আখেটক অর্থাৎ শিকার, দ্বিতীয় আখ্যানগুপ্তি, তৃতীয় শৃঙ্গারভোগ, চতুর্থ শকুন্তলাপ্রস্থান, পঞ্চম শকুন্তলা প্রত্যাখ্যান, ষষ্ঠ শকুন্তলা বিরহ। সপ্তম অঙ্কের নাম দেওয়া নেই তবে এর নাম হওয়া উচিত পুনর্মিলন।

প্রথম অঙ্কে রাজা দুষ্মন্ত-এর মৃগয়াযাত্রা এবং একটি আশ্রমের মৃগের অনুসরণ করতে করতে মহর্ষি কণ্বের তপোবনে আগমন। সেখানে প্রথম দর্শনেই শকুন্তলা ও দুষ্মন্ত পরস্পরের প্রতি প্রেমাসক্ত হন, দ্বিতীয় অঙ্কে সেই প্রণয়ের অগ্রগতি দেখানো হয়েছে। রাজা আশ্রমের যজ্ঞবিঘ্নকারী রাক্ষসদের দমন করার জন্য সেখানেই থেকে গেছেন। তৃতীয় অঙ্কে দুষ্মন্ত-শকুন্তলার পারস্পারিক অনুরাগ এবং গান্ধর্বমতে উভয়ের বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে। চতুর্থ অঙ্কে রাজার চিন্তায় উদাসীনা শকুন্তলার প্রতি দুর্বাসার অভিশাপ এবং মহর্ষি কণ্বের আগমন ও শকুন্তলাকে পতিগৃহে প্রেরন করা হয়েছে। এই অঙ্কে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের যে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক চিত্রিত হয়েছে বিশ্বসাহিত্যে তার তুলনা নেই। পঞ্চম অঙ্কে রাজা দুষ্মন্ত কর্তৃক শকুন্তলা প্রত্যাখ্যান এবং শকুন্তলার জননী মেনকা কর্তৃক শকুন্তলাকে মারীচের তপোবনে আনয়ন, ষষ্ঠ অঙ্কে জটিলতার অবসান ঘটেছে। শকুন্তলাকে দেওয়া অঙ্গুরীয় বা অভিজ্ঞান জেলের হাত থেকে রাজার হাতে এসে পৌঁছায়। অঙ্গুরীয় দর্শনে রাজার সকল কথা মনে পড়ে এবং তিনি শকুন্তলা বিরহে রাজা উদভ্রান্ত হয়ে পড়েন, সপ্তম অঙ্কে দানববিজয়ী দুষ্মন্ত স্বর্গলোক থেকে মর্ত্যে প্রত্যাবর্তনের সময় মারীচের তপোবনে আসেন এবং ঘটনা পরম্পরায় পুত্র সর্বদমন সহ শকুন্তলার সঙ্গে দুষ্মন্তের পুনর্মিলন ঘটে,

অভিজ্ঞান শকুন্তলম, কালিদাসের তথা সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নাট্যকীর্তির নিদর্শন, এর বিষয়বস্তু মহাভারত থেকে নেওয়া হলেও কাহিনী গ্রন্থন ও চরিত্র চিত্রনে কালিদাস মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন। মহাভারতে দুর্বাসার অভিশাপের প্রসঙ্গটি ছিলনা। সেই শাপের প্রসঙ্গটি এনে কালিদাস রাজার চরিত্রটিকে রক্ষা করেছেন। শকুন্তলা চরিত্রের

বিবর্তন খুবই আকর্ষণীয়। মহাভারতের শকুন্তলার বহুভাষিণী ও বিষয়-বুদ্ধি সম্পন্না। কালিদাসের শকুন্তলা অরণ্যকন্যা, সরলা ও বাক্যেহত। দুষ্মন্ত চরিত্রটিকেও কালিদাস বিরহের অগ্নিস্পর্শে পরিশুদ্ধ ও উজ্জ্বল করে তুলেছেন। নায়ক নায়িকার চরিত্র ছাড়াও অন্যান্য পার্শ্বচরিত্র চিত্রনে কালিদাসের কৃতিত্ব কম নয়, বনবাসী কণ্বের মধ্যে পালিতা কন্যা শকুন্তলার জন্য পিতৃহৃদয়ের স্নেহ-মমতা ও তার বিচ্ছেদ বেদনা বিধুরতা, হংস পাদিকের গানে উপেক্ষিতা নায়িকার চিত্তবেদনা চমৎকার ফুটে উঠেছে।

মালতীমাধব

মালতী মাধব নাটকে নায়ক নায়িকার হৃদয়গত প্রণয় চেষ্টার বর্ণনা প্রধান স্থান অধিকার করলেও এখানে অদ্ভুত বীভৎস ও রৌদ্র প্রভৃতি রসের অবতারণা ভবভূতির কৃতিত্বের পরিচায়ক। এই নাটকে তিনি বামাচারী তন্ত্র সাধনার বিষয়ে মূল্যবান তথ্য বিশ্বাসযোগ্যভাবে উপস্থাপিত করেছেন। সেই সঙ্গে বৌদ্ধ সাধিকা সন্ন্যাসিনীদের, অনুকূল্য সমূলক কার্যকলাপের পরিচয় দিয়েছেন, তাছাড়া উদগ্রপূর্ণ সংলাপ সৃষ্টি ভবভূতির অন্যতম কৃতিত্ব। মালতীমাধবে ভবভূতির কবিত্ব শক্তির পরিচয়ও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। মহাশ্মশানের বর্ণনায় নাট্যকার বীভৎস রসের সঙ্গে দর্শক চিত্তে ভয় ও, বিস্ময়, ঘৃণা, উৎসাহ জাগিয়ে তুলতে পেরেছেন